তিনসঙ্গী : রবীন্দ্রজীবনের অন্ত্যপর্বের ফসল

জ্যোতির্ময় দাশ

রবীন্দ্রজীবনের (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.) অন্ত্যপর্বের শেষ তিনটি গল্পকে একসঙ্গে সংকলিত করে প্রকাশিত হয়েছিল গল্পগ্রন্থ তিনসঙ্গী (প্রকাশ: ১৯৪১)। গল্প তিনটি যথাক্রমে রবিবার (প্রকাশ প্রথম : আনন্দবাজার ১৩৪৬); শেষকথা (শনিবারের চিঠি: অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬) এবং ল্যাবরেটরি (শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৪৭)।

রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করেছিলেন একান্তই কিশোর বয়েসে সে কথা আমরা জানি। গল্প লিখেছিলেন তার কিছু পরে। তাঁর নিজের ভাষায় : 'ষোলো বছর বয়সের...আরম্ভের মুখেই দেখা দিয়েছে ভারতী।...আমি লিখে বসলুম এক গল্প [ভিখারিনী]।' সে গল্প ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল শ্রাবণ ১২৮৪ বঙ্গাব্দে। সেই ভিখারিনী থেকে তিনসঙ্গী-র গল্প রচনার কাল হিসেবে তিনি প্রায় ৬৪ বছর ধারাবাহিকভাবে গল্প রচনা করেছেন। তিনি অন্য আর কিছু রচনা না করলেও শুধু গল্পকার হিসেবেও বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন!

আমাদের এই প্রতিবেদনের বিশেষ আলোচ্য বিষয় তাঁর এই দীর্ঘ সৃজনশীল জীবনের অন্তিমপর্যায়ে লেখা তিনসঙ্গী-র তিনটি গল্প হলেও আমরা একটু দ্রুতচালে তাঁর গল্পলেখার ভূ-মন্ডলটি ছুঁয়ে যাবো পর্বান্তরের বৈশিষ্ট্য এবং ইতিহাসের ধারাবাহিকতার শর্ত রক্ষার প্রয়োজনে। সব থেকে আগে যে কথাটি বলা জরুরি এবং তত্ত্বের প্রসঙ্গে যেটি বিশেষ

গুরুত্বপূর্ণ তা হল রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই এসেছিল বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটোগল্প। তাঁর আগে কেউ কেউ এই ধরনের রচনা সৃষ্টির চেষ্টা করলেও এ বিষয়ে সকলেই একমত যে রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যের যথার্থ ছোটোগল্পের স্রষ্টা।

আমরা জানি জমিদারি দেখাশোনার কাজে শিলাইদহে থাকার সময়ে তিনি পূর্ববাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। দেখেছিলেন প্রকৃতি লালিত গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষদের জীবন যাপন এবং ব্যথা-বেদনার চিত্রগুলি। তাদের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত জীবনকাহিনীই ছিল তার ছোটোগল্পের রসদ। তিনি নিজেই এ প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'সাজাদপুরে যখন আসতুম চোখে পড়ত গ্রামজীবনের চিত্র, পল্লীর বিচিত্র কর্মোদ্যম। তারই প্রকাশ পোস্টমাস্টার, সমাপ্তি, ছু'টি প্রভৃতি গল্প।

ভিখারিনী তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত গল্প হলেও রবীন্দ্রনাথ নিজে একটি প্রকৃত ছোটোগল্পের মর্যাদা বা স্বীকৃতি দিতে চাননি। তাঁর জীবদ্দশায় কোনো গল্পগ্রন্থে বা সংকলনে ভিখারিনী স্থান পায়নি। প্রথম গল্পের সাতবছর পরে (১২৯১ বঙ্গাব্দে) লেখা ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত এবং গল্পগুচ্ছ ১ম খন্ডে সংকলিত ঘাটের কথা-কে প্রথম রবীন্দ্র-ছোটগল্প বলে ধরা হয়। ভারতী, হিতবাদী, নবজীবন, বালক-এ কয়েকটি গল্প প্রকাশের পর সাধনা-তে তিনি চারবছরে (১২৯৮-১৩০২) ছত্রিশটি গল্প লিখেছেন। ছিন্নপত্র-র একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন (৩০ আষাঢ়, ১৩০০ বঙ্গাব্দে) :

'এক এক সময় মনে হয় আমি ছোট ছোট গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারিনে– লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়।'

বাংলাসাহিত্যে ছোটোগল্প রচনার যেহেতু তিনি পৃথিকৃৎ– তাই নিজের গল্পের কাঠামো থেকে প্রকৃত ছোটোগল্পের সংজ্ঞা নির্ণয় করলেন। বিষয়ের একমুখিনতা, ঘটনাবাহুল্যকে বর্জন, চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও পরিণামের অতৃপ্তিজনিত জিজ্ঞাসাময় উপসংহার ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য। জীবনের একটি ক্ষণমুহূর্তকে অনন্তের ব্যঞ্জনাদান ও সমাপ্তিতে জীবনসত্যের চকিত উদ্ভাসন রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের লক্ষণ। তাঁর গল্পের ঘটনার চেয়ে অণুভাবনারই প্রাধান্য দেখা যায়। অনেকসময়ই কাহিনী দাঁড়িয়ে থাকে মৃদু লিরিকধর্মী বিশেষ একটি ভাবের ওপর। রবীন্দ্রনাথের গল্পের পৃথিবী মৃদু শান্ত। মনের অতলান্ত গভীরে ডুব দিয়ে জটিল বাসনা ও মনস্তত্ত্বের কথা বলেছেন (নষ্টনীড়)। প্রকৃতির উদার শ্যামল পরিবেশে বেড়ে ওঠা এক মুক্তমনা আসক্তিহীন ভাবের গল্পে লিখেছেন এক কিশোরের কথা (অতিথি) যার কাছে স্নেহ ভালোবাসার বন্ধনও এক ধরনের শৃঙ্খল। নিখিল পিতৃহৃদয়ের শাশ্বত অনুভব ঋদ্ধ গল্প 'কাবুলিওয়ালা'। সম্মোহিত, স্বপ্নাচ্ছন্ন ও নিদ্রাজাগর অবস্থায় মানুষের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা দ্বিতীয় সত্তার এক ব্যতিক্রমী গল্প 'জীবিত ও মৃত'।

তাঁর ছোটোগল্পে বাস্তবতার প্রসঙ্গে তিনি নিজেই একসময়ে বলেছিলেন যে তাঁর বিভিন্ন কাহিনীতে বাঙালি সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি প্রথম ধরা পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে কবিতা ও উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের যে তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক সত্ত্বার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়, তার ছোটোগল্প সেই প্রভাব থেকে একেবারেই মুক্ত। উপন্যাসের নাগরিক বৈদগ্ধ্যময় প্রেক্ষাপট থেকে গল্পগুচ্ছ-এর কাহিনীতে তিনি বিচরণ করেছেন গ্রামীন ক্ষেত্রে– তাঁর গল্পের গায়ে লেগে আছে মর্ত্যধূলির স্পর্শ। কঙ্কাল, নিশীথে, মণিহারা ও ক্ষুধিত পাষাণ-তে আছে রহস্যময় কুহেলির অতিপ্রাকৃত পরিবেশ কিন্তু সেই অতিপ্রাকৃত গল্প ও বাস্তব ভূমিতেই দাঁড়িয়ে আছে।

যে সব গল্প উল্লেখিত হল তা সবই গল্পগুচ্ছ পর্বের বা যুগের। এরপরে কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথকে পাই সবুজপত্র (সম্পাদক : প্রমথ চৌধুরী)-র গল্প লেখক হিসেবে। সবুজপত্র-র যুগ (১৩২১ বঙ্গাব্দ) থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনোধর্মে পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। একটা যেন বাঁকবদল চোখে পড়ে। ভাবুকতার দিকে কবির টান। প্লট রচনা করেছেন এমন এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে যেখানে তিনি একটা বক্তব্য রাখতে পারেন, চরিত্র ক্রমশ হয়ে উঠছে ব্যক্তিসর্বস্ব প্রাতিস্বিক। গল্পের ক্ষেত্রে এই বাঁকবদল স্পষ্ট হয়েছিল তিনসঙ্গী পর্বে।

এই পর্বে রবীন্দ্র ছোটোগল্প আশ্চর্যভাবে আধুনিক হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রজীবনের অন্ত্যপর্বের তিনটি গল্পের তীক্ষ্ণ ঝলসে ওঠা বিদ্যুতের মতো দীপ্তভাষার প্রকাশ। আধুনিকতার অন্তরালে মানসচেতনার ফল্গু প্রভাব বয়ে গেছে। 'রবিবার' -এর কেন্দ্র চরিত্র আর্টিস্ট হলেও তিনটি গল্পেই বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানচিত্ত নায়ক এবং এক বৈজ্ঞানিক বাতাবরণের পটভূমিকা আছে। তিনসঙ্গী-র স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গল্পগুচ্ছ-র রবীন্দ্রনাথের যে অমিল - সত্তা তা নিয়ে সাহিত্য সমালোচকেরা দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। 'শেষকথা' গল্পটি প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ) :

'এখনকার গল্পগুলো গল্পগুচ্ছের মত নয়– এগুলো বড় বেশি সাইকোলজিক্যাল হয়ে পড়ে। গল্পগুচ্ছের গল্পগুলো যেমন মানুষের প্রত্যহের ঘরোয়া জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে আজকাল আর সেরকম হয় না। আশ্চর্য লাগে আমার, কি করে অত details মনে হোতো, লিখতুম কি করে।'

রবীন্দ্রনাথের এই আত্মোপলব্ধি সঠিক বা গ্রহণযোগ্য কিনা বা গল্পগুচ্ছ-র সঙ্গে তিন সঙ্গী-র কাহিনী কোনোভাবে ন্যূন কিনা সে কথা বিদগ্ধ সাহিত্য সমালোচকেরা পর্যালোচনা করবেন, কিন্তু কবির এই উক্তি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রাক্‌কথনের পর আমরা তিনসঙ্গী-র তিনটি গল্পের বিষয়বস্তুর একটু গভীরে প্রবেশ করতে চাই।

দুই

তিনসঙ্গী-র ত্রয়ী গল্পের প্রথম গল্প রবিবার। শেষ পর্বের তিনটি গল্পের ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সংহত ঋজু ও পরিমিত ভাষা প্রয়োগের শিল্প লাবণ্যের শীর্ষবিন্দুকে স্পর্শ করেছেন। প্রকৃতিকে অতিক্রম করে তিনি আধুনিক নাগরিক নারী-পুরুষের মনোজগতের গভীরে লেখকের সন্ধানী দৃষ্টি ফেলেছেন।

রবিবার গল্পটি প্রথমপুরুষে বর্ণনা করেছেন লেখক। নায়ক পিতার দেওয়া অভয়াচরণ নামটিকে বদলে অভীক করে নিয়েছে। তার সংলাপের ধরন, বুদ্ধিদীপ্ত সপ্রতিভতা আমাদের শেষের কবিতা-র অমিতের স্মৃতিকে উজ্জ্বল করে। গল্পটি একটি দীর্ঘ চিঠির মাধ্যমে শেষ হয়েছে। শেষের কবিতা শেষ হয়েছে একটি কবিতা যা প্রকারান্তরে ছন্দোবদ্ধ একটি পত্রই। ব্রাহ্মণ বংশের গোঁড়া আস্তিক বিত্তবান বাবা অম্বিকাচরণের ছেলে হয়েও অভীকের ধর্মের প্রতি কোনো বিশ্বাস ছিল না– সেটা সে নামবদলের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ্যে আনে এবং ধর্ম নিয়ে মতান্তরের কারণে সে শেষপর্যন্ত ত্যাজ্যপুত্র হয়েছে। তার জীবনে দুটো পরস্পর বিরোধী জাতের শখ ছিল, এক কলকারখানা জোড়াতাড়া দেওয়া আর - এক ছবি আঁকা। তার ছবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার জন্য কলেজে সতীর্থদের মধ্যে প্রচুর স্তাবক নারী-পুরুষ থাকলেও সহপাঠী বিভার সপ্রশংস স্বীকৃতি পাবার আশায় সে অধীর হয়ে থাকে। এখানে রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে একটু উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

'এই ছবির ব্যাপারে দু জনের মধ্যে তীব্র একটা দ্বন্দ্ব ছিল। বিভা অভীকের ছবি বুঝতেই পারত না সে কথা সত্যি। অন্য মেয়েরা যখন ওর আঁকা যা-কিছু নিয়ে হৈ-হৈ করত, সভা করে গলায় মালা পরাত, সেটাকে বিভা অশিক্ষিতের ন্যাকামি মনে করে লজ্জা পেত। কিন্তু তীব্র ক্ষোভে ছট্‌ফট্ করেছে অভীকের মন বিভার অভ্যর্থনা না পেয়ে। দেশের লোকে ও ছবিকে পাগলামি বলে গণ্য করেছে, বিভাও যে মনে মনে তাদেরই সঙ্গে যোগ দিতে পারলে এইটেই ওর কাছে অসহ্য। কেবলই এই কল্পনা ওর মনে জাগবে যে, একদিন ও য়ুরোপে যাবে আর সেখানে যখন জয়ধ্বনি উঠবে তখন বিভাও বসবে জয়মাল্য গাঁথতে।'

অভীকের আর্টিস্ট সত্তাকে উপলক্ষ্য করে এই সময়ের ছবি - আঁকিয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের মনোভাবনাই কি প্রকাশ পেল? অভীকের ছবি সম্পর্কে বিভা যে জটিলতার কথা বলে সেটা যে রবীন্দ্রনাথের ভিন্ন ঘরানার ছবি ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ এবং অনভ্যস্ত এদেশের দর্শকদের প্রতিক্রিয়াই অভিক্ষেপ।

পিতার আনুকুল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে শিল্পী হবার লক্ষ্যে অভীক নানা কাজে লিপ্ত থেকেছে। বার্ণ কোম্পানীতে হেড মিস্ত্রির কাজ করেছে এবং য়ুরোপের 'জয়ধ্বনি' আদায়ের আশায় (নিজেকে প্রেমিকার কাছে প্রমাণিত করার আশাতেও) শেষ পর্যন্ত জাহাজের ইঞ্জিন কয়লা জোগানের কাজ নিয়ে সে সমুদ্রপথে বিলেতযাত্রা করেছে। বিভার নীরব ব্যক্তিত্ব ও অধরা মাধুরীর আভা শিল্পী অভীককে বেশি আকর্ষণ করেছে। তার প্রচলিত আধুনিক জীবন ধারায় মনীষা, শীলা নামক নানা নারীর স্বচ্ছন্দ প্রবেশ ঘটলেও সে কিন্তু তার অন্তর্লোকের দুয়ার কেবল বিভার আগমনের জন্য খোলা রেখেছে। পুরুষের কর্মপথের পাথেয় হিসাবে নারীর প্রেরণা যে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ রবিবার গল্পে নতুনভাবে প্রকাশ করেছেন। পরোক্ষে বলতে চেয়েছেন পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক প্রেমেই আসে সাধনার পূর্ণতা। এই বিশ্বাস কবির শেষ বয়সের উপলব্ধি নয়– চিত্রাঙ্গদা -র সময় থেকেই তিনি নারীপুরুষের সম্মিলিত কর্মব্রতের কথা বলেছেন, জীবনের অন্ত্যপর্বে তাকে আরও সুস্পষ্ট করে জানালেন– তিনসঙ্গী -তে। অপরিহার্য করে প্রকাশ করলেন পুরুষের সৃষ্টিকর্মে নারীস্বভাবের অনির্বচনীয় মাধুর্যের প্রয়োজনীয়তার। সেজন্য অনেক পাওয়ার পরও অন্তরোতৃপ্ত অভীক বিভাকে অন্তরে পাবার সাধনায় ব্রতী।

প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ যে চিরকালীন এক তরুণ প্রেমিক তার চমৎকার স্বাক্ষর রেখেছেন রবিবার গল্পের নায়িকার নামকরণে– বিভা নামে প্রথম শব্দিটিকে ইংরেজি 'Bee' (বী) অর্থাৎ মৌমাছিতে পরিবর্তিত করে অভীক তাকে চিঠিতে সম্বোধন করেছে 'বী আমার মধুকরী' বলে। এই নামের রূপান্তরের মাধ্যমে অবিশ্বাসের বিষ হয়ে যায় প্রেমের সুধা, কারণ অভীক বিভাকে এক সময় বলেছে, 'আমি তোমাকে দেখি আর ভয় হয় কোনদিন ফস্ করে মেনে বসবো তোমার ভগবানকে।' –অর্থাৎ বিভার প্রেমের মধুতে নাস্তিক অভীক একদিন আস্তিক ঈশ্বর বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক। সকল বিচারে রবিবার এক অনন্য-সাধারণ মিলনান্তক প্রেমের কাহিনী।

সংলাপ মুখরতায় আইডিয়ালিস্টিক একটি নির্ভেজাল প্রেমের মিলনান্তক গল্পের নাম রবীন্দ্রনাথ রবিবার কেন দিয়েছেন? আপাতদৃষ্টিতে নামকরণের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একেবারেই কোনো কারণ ছাড়াই যেমন তেমন করে একটা নাম দেবেন, তা মানা যায় না। এ প্রসঙ্গে বাংলাভাষা সাহিত্যিক এবং অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য হল– 'নামটি ব্যাখ্যাত নয় ব্যঞ্জিত।' কিন্তু নামটির একটি সরল ব্যাখ্যা করা যায়। রবিবার গল্পটির মধ্যেই একটি ছুটির আমেজ আছে, আছে রবীন্দ্র-অভিনিবেশের গভীরতায় একধরনের মুক্তির বার্তাও। সমগ্র গল্পে অমরবাবুর কাছে বিভা একবার 'রবিবারের ছুটি'র উল্লেখ করেছে। সেদিনটি ছিল ব্রহ্মমন্দিরে বিভার উপাসনার দিন। সেখান থেকে বাড়িতে ফিরে বিভার অভীকের সঙ্গে দেখা হয় এবং গল্পের মূল প্রেক্ষিতটি সেই রবিবারের সময়-সীমায় আবদ্ধ। রবিবার কর্ম বিরতির দিন, তাতে আছে মুক্তির আভাস, গল্পের শেষে আছে অভীকের মানস মুক্তির ইঙ্গিত–অমলিন মুক্তি দিয়ে ঘেরা বিভার প্রেমের তার প্রার্থিত সার্থকতা সে খুঁজে পেতে চাইছিল। বিভার প্রেমের জোরেই নাস্তিক অভীক আস্তিক হয়ে উঠেছে– প্রেমই এই মুক্তির সন্ধান দিয়েছে।

রবিবার-এর বিভার মধ্যে প্রেমের অনন্য বিভা রূপ পেয়েছে। প্রেমই তার তপস্যা। সেই তপস্যা শেষ পর্যন্ত সত্য হল অভীকের জীবনে। নীহারিকা পুঞ্জের মধ্য থেকে ধ্রুবতারকাকে বেছে নেবার সাধনায় অভীক জয়ী হল। বিভার অচঞ্চল সংযত শান্ত সৌন্দর্য এবং শাশ্বত প্রেমের মহিমাই এই গল্পের মূল পটভূমিকা।

তিন

'শেষকথা' এই ত্রয়ী গল্প সংকলনে দ্বিতীয় কাহিনী। শেষের কবিতা উপন্যাসে মুক্ত প্রেমের অসীম ভাবনার যে তাত্ত্বিক রূপের প্রকাশ কবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তারই এক ভিন্নতর ও বিস্তৃততর অবয়বের চালচিত্র আঁকলেন শেষকথা-য়।

খুব সহজ প্রতিবেদনে কাহিনীটি বিধৃত করতে হলে এভাবে বলা যায় যে বাংলাদেশের বিপ্লবীদের এক জন নবীনমাধব উপলব্ধি করেছিল যে সন্ত্রাসের মাধ্যমে ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়ানো সম্ভব নয়। তাই সে যন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে দেশের দুর্গের ভিত মজবুত করে তোলার বাসনায় জাহাজের খালাসি হয়ে আমেরিকায় পৌঁছোয়। যন্ত্রের মাল মশলা-সংগ্রহ শিখতে জিওলজি বিদ্যায় পন্ডিত হয়ে মাতৃভূমি ভারতবর্ষের এক নেটিভ রাজ্যের খনিজ সম্পদ খুঁজে বার করার ব্রত ও দায়িত্ব নিয়ে দেশে ফিরে আসে। কর্মপাগল মানুষটির সঙ্গে ছোটোনাগপুরের অরণ্যভূমির জৈব প্রাণশক্তির প্রেক্ষাপটে নায়িকা অচিরার আকস্মিক দেখা হয়। বিদূষী এবং রূপসী অচিরার এক অতীত আছে। আত্মভোলা এক অধ্যাপকের বাবা মা হীন এই নাতনির সঙ্গে ভবতোষ নামক এক যুবকের বিবাহ সম্বন্ধ পাকা হয়। অধ্যাপকের অর্থে সে বিদেশে আই. সি. এস হতে যায়—ফিরে এসে বিবাহ সম্পন্ন হবে। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সুযোগ সন্ধানী ভবতোষ ইন্ডিয়া গবমেন্টের এক উচ্চপদস্থ মুরুব্বির মেয়েকে বিয়ে করে ভবিষ্যতের উন্নতি পাকা করতে। প্রথম জীবনের প্রেমিকের এই বিশ্বাস ভঙ্গে আহত অচিরা সমাজ সংসার থেকে পালিয়ে আসে অরণ্যের কোলে। নবীনমাধব ও অচিরার মধ্যে প্রেম গড়ে ওঠে। কিন্তু সে প্রেম এক তত্ত্বের আবরণে ঢাকা, অচিরা ও নবীনমাধবের প্রেমকে প্রচলিত পূর্ণতার পরিণতি না দিয়ে এক 'আধারবিহীন' ভালোবাসার তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন লেখক। নরনারীর জৈবিক প্রেমসম্পর্ককে এ গল্পের অন্যতর এত আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সমগ্র বিশ্বে সৃষ্টিশীল পুরুষচিত্তের সঙ্গে নারীচিত্তের যোগে আধুনিক সভ্যতা সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে এমনই এক প্রেমের অভিনব উত্তরণের ছবি বা তত্ত্ব তুলে ধরেছেন লেখক।

রবিবার-এর মতোই অতি আধুনিকতার আড়ালে প্রবাহিত সংযত সৌন্দর্যময় অচঞ্চল গভীর প্রেমের দেখা পাওয়া যায় শেষকথা কাহিনীতেও। এখানে নবীনমাধব ও অচিরার গভীর প্রেমাণুচেতনাকে এক নির্বিশেষ তত্ত্বের রূপ দিয়েছেন কবি। রোম্যান্টিক কুয়াশা ও তত্ত্বময়তা এখানে অনিকেত নির্বিশেষ তত্ত্বে চিত্রিত। বনভূমির আদিম শক্তির আকর্ষণকেও কবি এক ভিন্নতর ব্যাখ্যা করেছেন। রবিবার গল্পের প্রথমে দেখা যায় আইডিয়ার ফুলঝুরি কিন্তু পরিণতিতে পাওয়া যায় গভীর প্রেমের আরাধনার পূর্ণতা। শেষকথা-র শুরু প্রেমে, শেষ আইডিয়াতে। এক অর্থে এই দুটি গল্প একে অন্যের পরিপূরক। অচিরা প্রেমকে এক 'অন্ধশক্তির আক্রমণ' বলে ফিরিয়ে দেয় নবীনমাধবকে।

জীবশক্তির বা মোহের সম্মোহনের ওপরে চিত্তশক্তির জয় ঘোষণার তত্ত্বই শেষকথা-র শেষকথা।

শেষকথা গল্পের নামকরণ সুচিহ্নিত। অচিরার শেষ কথাতেই গল্প শেষ কিংবা এভাবেও বলা যায় যে সেই শেষ কথা থেকেই গল্পের শুরু। অচিরা বলেছে নবীনমানধবকে ইম্পার্সোনাল প্রেমের স্বরূপ বোঝাতে:

আপনাদের সম্পদ জ্ঞানের—উচ্চতম শিখরে সে জ্ঞান ইম্পার্সোনাল। মেয়েদের সম্পদ হৃদয়ে যদি তার সব হারায় —যা -কিছু বাহ্যিক, যা দেখা যায়, ছোঁয়া যায়, ভোগ করা যায়, তবু বাকি থাকে তার সেই ভালোবাসার আদর্শ যা অবাঙ্মনসোগচর:। অর্থাৎ ইম্পার্সোনাল।'

এই ইম্পার্সোনাল আধারবিহীন ভালোবাসার তত্ত্বেই শেষকথার সার্থক পরিণতি।

চার

এই পর্বের শেষ গল্প 'ল্যাবরেটরি'। তিনটি গল্পের মধ্যে সবচেয়ে দুঃসাহসী গল্প। ল্যাবরেটরি-তে একই সঙ্গে বিজ্ঞান সাধনা ও প্রেমতপস্যার সমন্বয় ঘটেছে। গল্পের নির্যাসটুকু আলোচনার শুরুতে দেখে নেওয়া যাক্।

গল্পের নায়ক নন্দকিশোর লন্ডন থেকে পাশ করে আসা ইঞ্জিনিয়ার। জ্ঞানতপস্বী বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। রেল কোম্পানির দুটি ব্রিজ তৈরি করার দায়িত্ব ছিল তাঁর। পাওনার সঙ্গে উপরি নিতে কোনো অনীহা ছিল না। কিন্তু ওই দু ধরনের রোজগারের টাকায় বাবুগিরি না করে দেশ বিদেশ থেকে দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য যন্ত্রপাতি কিনে এক মস্ত গবেষণাগার করেছিলেন। ঘুষ নেওয়ার অপবাদে রেলের চাকরি যেতে দমলেন না মোটেই। উদ্যোগী মানুষ তাই রেল - কোম্পানির পুরোনো লোহা-লক্কড় কিনে যুদ্ধের বাজারে ব্যবসা করে চতুর্গুণ মুনাফা করে ফুলে ফেঁপে উঠলেন। অকৃতদার- ল্যাবরেটরি ছাড়া অন্য কিছুতে আসক্তি ছিল না। এমন সময় আর একটি শখ পেয়ে বসল তাঁকে। এক রমণীর আগমন ঘটল তাঁর জীবনে। সেই আবির্ভাবের বর্ণনাটুকু কবির নিজের ভাষায় উল্লেখ করা হল:

> 'একসময় নন্দকিশোর পাঞ্জাবে ছিলেন তাঁর ব্যবসার তাগিদে। সেখানে জুটে গেল তাঁর এক সঙ্গিনী। সকালে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন, বিশ বছরের-মেয়েটি ঘাগড়া দুলিয়ে অসংকোচে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত— জ্বলজ্বলে তার চোখ, ঠোঁটে একটি হাসি আছে যেন শান-দেওয়া ছুরির মতো। সে ওর পায়ের কাছে ঘেঁষে এসে বললে, 'বাবুজি আমি কয়দিন ধরে এখানে এসে দু'বেলা তোমাকে দেখছি। আমার তাজ্জব লেগে গেছে।'
>
> নন্দকিশোর হেসে বললেন, 'কেন এখানে তোমাদের চিড়িয়াখানা নেই নাকি?'
>
> সে বললে, 'চিড়িয়াখানার কোনো দরকার নেই। যাদের ভিতরে রাখবার তারা বাইরে সব ছাড়া আছে। আমি তাই মানুষ খুঁজছি।'
>
> 'খুঁজে পেলে?'
>
> নন্দকিশোরকে দেখিয়ে বললে, 'এই তো পেয়েছি।'

নন্দকিশোর হেসে বললেন, 'কী গুণ দেখলে বলো দেখি।'

ও বললে 'এখানকার বড়ো বড়ো সব শেঠজি গলায় মোটা সোনার চেন, হাতে হীরার আংটি তোমাকে ঘিরে এসেছিল– ভেবেছিল বিদেশী, বাঙালি, কারবার বোঝে না। শিকার জুটেছে ভালো। কিন্তু দেখলুম তাদের একজনেরও ফন্দি খাটল না। উলটে ওরা তোমারই ফাঁসকলে পড়েছে। কিন্তু তা ওরা এখানে বোঝেনি, আমি বুঝে নিয়েছি।'

নন্দকিশোর চমকে গেল কথা শুনে। বুঝলে একটি চিজ বটে–সহজ নয়।'

জহুরি জহর চেনে। পাঞ্জাবি মেয়েটির নাম সোহিনী। পশ্চিমী ছাঁদে, সুকঠোর এবং সুন্দর চেহারার মধ্যে থেকে 'ঝক ঝক্ করছে ক্যারেকটারের তেজ।' নন্দকিশোর আংটি বদল করে তাকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করলেন। প্রৌঢ় বয়সে নন্দকিশোর মারা যেতে সোহিনী তার স্বামীর ব্রতটিকে তার নিজের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করলে। ল্যাবরেটরিতে স্বামীর মূর্তি বসিয়ে ধুপধুনোর সেটাকে মন্দির করলেও স্বামীর বিজ্ঞানের গবেষণার যাতে ছেদ না পড়ে তাই এক ঋত্বিকের সন্ধানে সোহিনীর যে প্রচেষ্টা সেটাই ল্যাবরেটরি গল্পের প্রেক্ষিত।

তিনসঙ্গী-র সবচেয়ে চমক লাগানো ঘটনাবহুল গল্প ল্যাবরেটরি। এ গল্পের নায়িকা সোহিনী কেবল রবীন্দ্রনাথের নয়, বাংলা সাহিত্যের আশ্চর্য চমক। নন্দকিশোরের বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরির মহাযজ্ঞের ঋত্বিকের খোঁজে সোহিনী নিবেদিতা। কিন্তু এই অন্বেষণের পথে তার প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার নিজের মেয়ে নীলা– গল্পকারের ভাষায় 'ভাঙন ধরানো মেয়ে।'

শুরুতে এই গল্পটিকে দুঃসাহসী উল্লেখ করা হয়েছে কারণ যুগের দাবিকে মেনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের আধুনিকতার পোশাকে সাজিয়েছেন। সোহিনী সর্বার্থেই আধুনিক– একদিকে অবিচল আদর্শ নিষ্ঠা, অন্য দিকের সর্বপ্রকার সংস্কার মুক্ততা, এমনকি প্রথাগত দেহগত সংস্কার থেকেও সে মুক্ত। নন্দকিশোরের মন ও কর্ম দুয়েই আধুনিক কালের স্পর্শ আছে। তার প্রথাবহির্ভূত জীবন ও সংস্কার মুক্ততার আড়ালে আধুনিককালের রূপ আমরা অনুভব করি। নীলা ও জাগানী ক্লাবের সদস্যদের মধ্যেও আধুনিক চটুল জীবনযাত্রার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

ল্যাবরেটরি গল্পে এসে রবীন্দ্রনাথ যেন ঠুন্‌কো ভারতীয়ত্বের সব ফাঁপা আদর্শের আচার সর্বস্বতাকে প্রকট করে দিয়েছেন। সোহিনী সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী যে মূল্যায়ন করেন তা হল:

'এই চরিত্রই তাহার ব্যক্তিত্ব, সংসারেও ইহাই তাহার একমাত্র নির্ভর ছিল।...চরিত্রের দার্ঢ্যের মূলেই তাহার মূল্য, অন্য মূল্যের আরোপ চলিবে না। রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী নারীর অভাব নাই, কিন্তু সর্বত্রই ব্যক্তিত্বের উপরে প্রেয়সীত্বের বা জননীত্বের আরোপ হইয়াছে।...কিন্তু সোহিনীর অন্য সংস্কারমুক্ত ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ নির্গুণ নারীত্ব যেমন সমুজ্জ্বলভাবে প্রকট এমন আর কোথাও হয় নাই।

সোহিনীর মুখে এবং আচরণে যে সব উচ্চারণ ও কার্যকলাপ বসাতে/ করাতে সে-সময় দুর্দান্ত স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জীবনকে দেখার এই খোলা অথচ দৃষ্টিভঙ্গির দৃঢ়তায় আধুনিকতার সঠিক মর্মকেই তুলে ধরেছেন তিনি। কালান্তর-এর অন্তর্গত 'নারী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক নারীদের যে রূপটি উপলব্ধি করেছিলেন সেখানে নারীর গৃহিণী এবং জননীর ভূমিকার উল্লেখ করেও তিনি বলেন:

'এই যে মুক্ত সংসারের জগতে মেয়েরা আপনিই এসে পড়েছে, এতে করে আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মানের জন্যে তাদের বিশেষ করে বুদ্ধির চর্চা, বিদ্যার চর্চা, একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠল।...কল্পান্তের ভূমিকায় নূতন সভ্যতা গড়বার কাজে মেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছে– প্রস্তুত হচ্ছে তারা পৃথিবীর সর্বত্রই। তাদের মুখের উপর থেকেই যে কেবল ঘোমটা খসল তা নয়– যে ঘোমটার আবরণে তারা অধিকাংশ জগতের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল সেই মনের ঘোমটাও তাদের খসেছে।'

আমাদের মনে হয় বদলে যাওয়া সময় ও কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে কবি নিজেও বেশ কয়েক কদম এগিয়ে এসেছেন। 'ঘোমটা' কেবল নারীদের নয়, খসেছে তাঁর মনের ওপর থেকেও। এই নতুন চেতনার নিরীখেই গড়ে উঠেছে সোহিনী চরিত্রের আচরণ। আর সেই স্বাধীনচেতা অথবা বেপরোয়া মেজাজ তৎকালীন বাঙালি নারীর মধ্যে সহজলভ্য হবে না মনে করেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ সোহিনীকে পাঞ্জাবি ললনা হিসেবে উপস্থাপনা করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। পরিবারের শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপকের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে হঠাৎ উঠে এসে তাঁকে চুম্বন করার ক্ষেত্রে একজন গৃহবধূর শালিনতার লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করিয়েছেন লেখক এই গল্পে। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ (মৈত্রেয়ী দেবী রচিত) থেকে আমরা জানতে পারি, ল্যাবরেটরি গল্পের পাণ্ডুলিপি মৈত্রেয়ী দেবীকে পড়তে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন:

'যদি অশ্লীলতার দোষ পাও তাহলে রুষ্ট হয়ো না। সে আদর্শবাদিনি, ওর ভিতরের আদর্শটি খুঁজে দেখো।'

নামকরণ প্রসঙ্গে আসা যাক্। ল্যাবরেটরি নামকরণ নিঃসন্দেহে যথেষ্ট ব্যঞ্জনাবহ। আপাতভাবে মনে হবে তা নন্দকিশোরের বিজ্ঞান গবেষণাগারের কথা ভেবেই লেখক এটি রেখেছেন। কিন্তু অন্যদিকে তা জীবনের রসায়নগারকেই ব্যঞ্জিত করে। জীবনের রসায়নগারেই তো সোহিনীর পরীক্ষা নিরীক্ষার নিরলস সাধনা। স্বামী নন্দকিশোরের সাধনার প্রতীক ব্যাবরেটরি। তার মৃত্যুর পর সেই ল্যাবরেটরির মধ্যেই তার মূর্তির সামনে চলেছে সোহিনীর উত্তরসূরি ঋত্বিক অনুসন্ধানের ব্রত। তিনসঙ্গী-র তিনটি গল্পেই এভাবে আমরা ব্যঞ্জনাগর্ভ নামকরণের ঐক্যসূত্রটি দেখতে পাই।

ত্রিবিধ বিন্যাসে বিচিত্র হলেও নরনারীর প্রেমসম্পর্কই তিনটি গল্পের প্রধান বিষয়। আধুনিক নাগরিক প্রেমকথা। রবিবার ও শেষকথা-র আধুনিকতার আড়ালে চিরন্তনী প্রেমমূর্তি আবিষ্কার করা কঠিন নয়। ল্যাবরেটরি-র নায়িকা পাঞ্জাবি ললনা সোহিনীর মধ্যে সেই প্রেম খুঁজতে যাওয়া বৃথা। কিন্তু সোহিনীর মধ্যে একটা খাঁটি মন ছিল, যার জন্য সে নন্দকিশোরের মূর্তিকে পুজো করত। ল্যাবরেটরি সোহিনীর পুজোর দেবতা।

আবার তিনসঙ্গী-র পুরুষ চরিত্র তিনটিতেই বিজ্ঞান মনস্কতা লক্ষণীয়। অভীক যন্ত্রশিল্পী ও আর্টিস্ট, নবীনমাধব ভূমিজ্ঞানী, নন্দকিশোর রসায়নবিদ। অর্থাৎ কেরানি, ডাক্তার, উকিল অধ্যাপকদের পরিমন্ডলের বাইরে রবীন্দ্রনাথ নায়কের সন্ধানে বৃহত্তর পরিধিতে বিচরণ করেছেন। ভাষার শাণিত ঋজু তীক্ষ্ণতা এবং চরিত্রদের সকলের বুদ্ধিদীপ্ত বাক্‌পটুতাও (শেষের কবিতার পর) গল্পত্রয়ীতে নতুন দিগন্তের দিশারী। এভাবেই আন্তরধর্মে তিনসঙ্গীর তিনটি গল্প ঐক্যসূত্রে বাঁধা। সম্ভবত এজন্যই রবীন্দ্রনাথ আলাদাভাবে তিনটি গল্প লিখে গ্রন্থাকারে তাদের ঐক্যসূত্রে বেঁধেছেন– তিনসঙ্গী নাম তার অভ্রান্ত পরিচায়ক। রবিবার, শেষকথা ও ল্যাবরেটরি প্রত্যেক নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, আবার তিনে মিলে

সামগ্রিকভাবে তিনসঙ্গী।

পাঁচ

আমাদের এই প্রতিবেদনে এতক্ষণ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যপর্বের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গল্পের মূলত সদর্থক অর্থাৎ ইতিবাচক প্রসঙ্গগুলির কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করেছি, সফল হওয়া গেছে কিনা সেটা অন্য কথা। কিন্তু তিনসঙ্গীর তিনটি গল্পের নঞর্থক কিংবা কোনো নেতিবাচক দিক আছে কিনা খুব সংক্ষেপে সেদিকে এবার একটু আলোকপাত করা যাক।

রবীন্দ্র সাহিত্যের এক সমালোচক মনে করেন কালান্তর-এর নারী প্রবন্ধে কবি নারীদের নতুন সভ্যতা গড়ার কাজে এগিয়ে আসার যে ভূমিকা প্রত্যক্ষ করার কথা বলেছেন তা তাঁর পরবর্তী গল্পের নারী চরিত্রের প্রতিফলিত হবে এমনটা অনেকেই আশা করেছিলেন, কিন্তু তা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনায় আধুনিকতার রেশ তিনসঙ্গী-তে এসে থমকে গেছে যেমন। প্রবল সম্ভাবনা ও প্রত্যাশা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ফিরে গেছেন তাঁর পুরোনো ইডিওলজিতে, যেখানে নারী জীবধাত্রী, কল্যাণময়ী এবং দেবীত্বের প্রতিভূ। বাস্তবতা, আদর্শবাদ এবং বিজ্ঞানচেতনা এই ত্র্যহস্পর্শে কিছুটা যেন বিমূঢ় হয়ে পড়ে গল্প তিনটি। এদের চরিত্রেরা অজস্র বুদ্ধিদীপ্ত কথা বললেও ঠিক যেন নড়ে চড়ে বেড়াতে পারে না, চাপা পড়ে যায় তাদের নিজেরই কথার বিশাল স্তূপের তলায়।

কেউ কেউ মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ নানান তর্ক ও তত্ত্ব বা বিভিন্ন সময়ের তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া যেন টুকরো টুকরো কাগজের মতো পিন দিয়ে গল্পের শরীরের (রবিবার-এ) গেঁথে দিয়েছেন, তাতে তর্ক এবং চরিত্র কেউই সুবিচার পায় নি। তর্কগুলি সঙ্গিন উঁচিয়ে থাকে, চাপা পড়ে যায় গল্পের চরিত্রেরা, নড়বড়ে প্লট আর মাথাতুলে দাঁড়াতে পারে না। বিভার ক্ষেত্রে কিছুটা অবিচার হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী হয়েও কয়েকটি অনাথা বালিকাকে পড়া দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া কিছুই করে না সে। আবার অমরবাবুর কাছে ম্যাথামেটিকস্ শিখেছে কিন্তু সেটা উচ্চতর গণিতের প্রতি কোনো আগ্রহের জন্য নয়, দরিদ্র অথচ মেধাবী অমরবাবুকে আর্থিক সাহায্য করার এটাই সবচাইতে ভদ্রস্থ উপায় বলে। একই শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নারীরা হল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক এক্ষেত্রে।

কিছু তত্ত্বগত অসংগতিও আছে। শেষকথার নবীনমাধব বাংলা দেশের বিপ্লবীদের একজন ছিলো। নির্বাসিত হয়ে আন্দামানে না থেকে পুলিশের চোখ এড়িয়ে জাহাজের খালাসি হয়ে পৌঁছল আমেরিকা। সেখানে 'যন্ত্রবিদ্যা' শিখে ফোর্ডের কারখানায় ঢোকেন। সেখানে মনে হয় 'যন্ত্রবিদ্যার আরও গোড়ায় যাওয়া চাই' এবং 'যন্ত্রের মালমশলা -সংগ্রহ শিখতে' ফোর্ডের কারখানা ছেড়ে ন'বছর কাটালেন 'খনিজ বিদ্যা' শিকতে। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে খালাসি হয়ে আমেরিকা যাবার আগে বিপ্লবী নবীনমাধবের পূর্ববর্তী শিক্ষা কেমন ছিল যে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সব দরজা অনায়াসে খুলে গিয়েছিল? যন্ত্রবিদ্যা অর্থাৎ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে খনিজবিদ্যা বা জিওলজিতে পারঙ্গম হয়ে গবেষণা করা কি এতই সহজ?

ল্যাবরেটরি গল্পের শুরুতে জানা যায় নন্দকিশোর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার, ডাকসাইটে ছাত্র। 'নিষ্কাম লোভে' রেল কোম্পানির (ব্রিটিশ সরকারের অধীন) টাকা সরিয়ে যে স্বপ্নের ল্যাবরেটরি গড়ে তোলেন সেখানে গ্যালভ্যানোমিটার, হাই ভ্যাকুয়াম পাম্প এবং মাইক্রোফটোমিটার কেনা হয়েছে আমিরিকা ও জার্মানি থেকে। বিদ্যুৎতরঙ্গ ও আলোকতরঙ্গ মাপার এই যন্ত্রের সুবাদে ল্যাবরেটরিটি পদার্থবিদ্যার গবেষণাগার বলে মনে হয়। এবং পরবর্তী ঋত্বিক হিসেবে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত রেবতী 'ম্যাগনেটিসম' নিয়ে কাজ করাও সেই নির্দেশ করে। কিন্তু রেবতীকে যাচাই করতে এসে সোহিনী নানারকম ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম নিয়ে আলোচনা করে তখন অবাক হতে হয় ম্যাগনেটিসম নিয়ে জক্টরেট ফিজিক্সের ছাত্রের এত গভীর বোটানির জ্ঞানের কী দরকার? গল্পকার সংলাপের ফাঁকে পাঠককে জানিয়ে দেন সোহিনী নিজের স্বামীর বইপত্র ঘেঁটে রীতিমত তৈরি হয়ে এসেছে রেবতী বিদ্যার আভাস নিতে। সোহিনী পদার্থ বিদ্যার কোনো প্রশ্ন করে না—তাহলে কী ইঞ্জিনিয়ার নন্দকিশোরের কাগজপত্রের মধ্যে বোটানিরই প্রাধান্য ছিল?

নন্দকিশোরের মৃত্যুর পর প্রবীণ পারিবারি শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপক মন্মথ চৌধুরী ছিলেন সোহিনীদের ফ্রেন্ড ফিলোসফার অ্যান্ড গাইড। অধ্যাপকের সঙ্গে সোহিনীর সম্পর্কটাও লেখক রহস্যময় এক অবিশ্বাস্য পর্যায়ে রেখে দেন। দুজন পরিণত বয়স্ক বন্ধু নারী পুরুষের বন্ধুত্বের সম্পর্ক এক অসামান্য সম্ভাবনাময় হতে পারতো বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানের প্রেক্ষাপটে ও চর্চায়। কিন্তু লেখক সোহিনীর মোহিনী পরিচয়টিকেও বিকশিত করতে চেয়েছিলেন। ফলে গুরুত্বপূর্ণ কথার মধ্যে সোহিনীর হঠাৎ হঠাৎ অধ্যাপকের গালে চুম্বন করার ব্যাপারটি তাদের সম্পর্ককে অহেতুক চটুল ও খেলো করে ফেলে।

ল্যাবরেটরি প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীকে প্রবীণ কবি বলেছিলেন, 'দায়ে পড়ে একটা গল্প লিখতে বাধ্য হয়েছিলুম, বহু কষ্টে লিখে নিষ্কৃতি নিয়েছি।' কবির এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় প্রৌঢ়ত্বের অবসন্ন প্রহরে এইসব গল্পে গতি ও অনুভবের তীব্রতা যেন ততটা দিতে সক্ষম হননি তিনি, দায়বদ্ধতার দায়িত্বটুকু মাত্র কষ্টে পালন করেছেন। গল্প শেষ করে নিষ্কৃতির স্বস্তি পেয়েছেন যেন অবশেষে!

প্রথম তিনখন্ডে গল্পগুচ্ছ-র গল্পে যে আকর্ষণ তিনসঙ্গী-র ত্রয়ী গল্পে রবীন্দ্র-কাহিনীর তন্নিষ্ঠ পাঠক হিসেবে তা না পাওয়া গেলে অন্যায় কিছু নেই— ভুলও কিছু নেই।

তথ্যঋণ

১। গল্পগুচ্ছ: জীবনের মেঘ ও রৌদ্র—ড. মীনাক্ষী সিংহ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ; ১৪১৫।

২। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ছোটগল্প—রবিন পাল; কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ, এবং মুশায়ো, ১৪১৭

৩। রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গী এবং প্রাসঙ্গিক কিছু ভাবনা—সুমনা দাস সুর; তদেব।

৪। তিনসঙ্গী : নিবিড় পাঠের অলিন্দে - রামী চক্রবর্তী; তদেব।

৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খন্ড (গল্প) -পশ্চিমবঙ্গ সরকার; ১৩৯৪।